অধ্যায়-১
কম্পিউটারের বিবর্তন ও প্রজন্ম

কম্পিউটারের সংজ্ঞা (Definition of computer) : কম্পিউটার একটি অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক যন্ত্র। ল্যাটিন শব্দ Compare থেকে ইংরেজি Compass শব্দটির উৎপত্তি। অম্পিউটার (Computer) শব্দটির আভিধানিক অর্থ গণণা যন্ত্র বা হিসেবকারী যন্ত্র। পূর্বে কম্পিউটার দিয়ে শুধুমাত্র হিসাবনিকাশের লাজই করা হতো। কিন্তু বর্তমানে অত্যাধুনিক কম্পিউটার দিয়ে অতি দ্রুতগতিতে জটিল হিসাবনিকাশের কাজ নির্ভুলভাবে করা পড়াও বহু রকমের কাজ করা যায়।কম্পিউটার সেকেন্ডের মধ্যে কোটি কোটি হিসাবনিকাশ করতে পারে। কম্পিউটারে কাজ করার গতি হিসাব করা হয় নোসেকেন্ডে (NS)। ন্যানোসেকেন্ড হচ্ছে এক সেকেন্ডের একশত কোটি ভাগের এক ভাগ সময় মাত্র।কম্পিউটারের অভ্যন্তরে রয়েছে অনেক বর্তনী। ইলেকট্রন প্রবাহের মাধ্যমে কম্পিউটারের যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালিত হয়। লকট্রনিক সংকেতের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে কম্পিউটার ল্যাংগুয়েজ বা কম্পিউটারের ভাষা।কম্পিউটারের বোধগম্য এ ভাষার মাধ্যমে কম্পিউটারে যে নির্দেশ দেয়া হয়, তারই ভিত্তিতে কম্পিউটার ফলাফল প্রদান করে। স্পিউটারের নির্দেশাবলিকে বলা হয় প্রোগ্রাম। প্রোগ্রাম ছাড়া কম্পিউটার একটি জড় পদার্থ ছাড়া আর কিছু নয়। উপযুক্ত প্রোগ্রামের এল কম্পিউটার জড় পদার্থ হতে গাণিতিক শক্তিসম্পন্ন বুদ্ধিমান যন্ত্রে পরিণত হতে পারে।

আধুনিক কম্পিউটারের জনক

- আধুনিক কম্পিউটারের জনক হলো বিজ্ঞানী চার্লস ব্যাবেজ। তিনি একাধারে একজন ইংরেজ যন্ত্র প্রকৌশলী, গণিতবিদ, ভারক ও দার্শনিক ছিলেন। তিনি ১৭৯১ সালে লন্ডনে জন্মগ্রহণ করে। প্রজ্ঞানী চার্লস ব্যাবেজ ১৮১০ সালে প্রথম যান্ত্রিক উপায়ে সংখ্যা ও সারণি গণনা করার জন্য যন্ত্রের ব্যবহারের কথা ভাবেন। এই ভাবনা থেকেই ১৮৩০ সাল নাগাদ তিনি একটি যন্ত্র তৈরি করার পরিকল্পনা করেন, যা পাঞ্চড্ কার্ড দিয়ে চালিত হবে এবং আয়ী একের পর এক কার্য সম্পাদন করতে পারবে। এই যন্ত্রটিই আধুনিক কম্পিউটারেরই প্রথম সংস্করণ হিসেবে ধরা হয় ও লিটিকাল ইঞ্জিন হিসাবেও পরিচিতি লাভ করে। তবে অর্থায়নের অভাবে চার্লস ব্যাবেজ তার এই প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করতে নি। কিন্তু তারপরও তার এই অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিন যান্ত্রিকভাবে বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যা সমাধান করতে পারতো তায় এই অনেক বৈশিষ্ট্য আজকের আধুনিক কম্পিউটার ডিজাইনে এখনো খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই চার্লস ব্যাবেজকেই আধুনিক টারের জনক বলা হয়।

আধুনিক কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্যাবলি

১। ইনপুট-প্রাসেস-আউটপুট: মূলত এই যন্ত্র আবিষ্কার করার উদ্দেশ্যই ছিল নির্ভুল গণনা ও তার সঠিক ফল প্রকাশ করা, কম্পিউটার ইনপুট-প্রসেস-আউটপুট এই পদ্ধতিতে কাজ করে থাকে। অর্থাৎ, আমরা যখন গণকযন্ত্রকে কোনো তথ্য পাঠাই এক সেই তথ্য এই যন্ত্রটি অসংখ্য সূক্ষ্ম বৈদ্যুতিক বর্তনীর সাহায্যে গণনা করে সঠিক ফলাফল দিয়ে থাকে। তাই মানুষের করা গণনায় থেকে যন্ত্রনির্ভর গণনা অনেকটাই নির্ভুল ও যুক্তিসঙ্গত। তবে মানুষ যদি ভুল তথ্য প্রদান করে সেক্ষেত্রে কম্পিউটার সেখানে ত্রুদ তথ্যই সরবরাহ করবে এবং তখন তাকে আমরা গার্বেজ ইনপুট ও গার্বেজ আউটপুট বলে থাকি।

২। উচ্চ গতিসম্পন্নতাঃ গণকযন্ত্র নির্ভুলভাবে গণনার পাশাপাশি দ্রুতগতিতে ফল ঘোষণা করতেও সক্ষম। যেহেতু এই যন্ত্র বৈদ্যুতিক সংকেতের সাহায্যে কাজ করে, তাই এই যন্ত্র মাইক্রো, মিলি, ন্যানো ও পিকোসেকেন্ডের মধ্যে ফলাফল বের করে দিতে পারে। একটু উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার গড়ে প্রতি সেকেন্ডে ৩০ থেকে ৪০ লক্ষেরও বেশি গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারে।

৩। ত্রুটি শনাক্তকরণ ও সংশোধন: মানুষের ভুল নির্ধারণ ও পরবর্তীতে সংশোধন করার ক্ষমতা এই যন্ত্রের তুলনায় অনেকটাই কম। এই যন্ত্রগুলো এমনভাবেই প্রোগ্রাম করা হয়, যা অতি দ্রুত ভুল শনাক্ত করতে ও সংশোধন করতে সক্ষম।

৪। মেমরি: কম্পিউটারের মেমরি বা স্টোরেজ স্পেস অনেকটাই বেশি থেকে থাকে। যার ফলে অসংখ্য কিৰো কোটি কোটি তথ্য কম্পিউটারের মধ্যে জমা রাখা সম্ভব। মানুষের থেকে ইনপুট পাওয়া মাত্রই এই যন্ত্র চট করে ও নির্ভুলভাবে সেসব তথ্য দেখতে রা ব্যবহার করতে পারে।

HARDWARE DEVICES OF COMPUTER

৫। বিশাল তথ্য প্রক্রিয়াকরণের ক্ষমতা। এই যন্ত্র মানুষের দেওয়া তথ্য ইনপুট আকারে গ্রহণ করে এবং সেই তথ্যকে বিশ্লেষণ করে আউটপুটের আকারে তা প্রদর্শন করে। তাই জটিল গাণিতিক হিসাব থেকে শুরু করে তথ্য ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ সবকিছুরসঠিক প্রক্রিয়াকরণের জন্যেই মানুষ এই যন্ত্রেই উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল।

৬। লজিক্যাল ডিসিশন মেকিংঃ কম্পিউটারের সমস্ত প্রক্রিয়াই নির্ভর করে যুক্তির উপর। যেহেতু এই যন্ত্রের নিজস্ব বুদ্ধি বা বিচার করার ক্ষমতা এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে দেওয়া হয়নি। এ কারণেই গণকযন্ত্রগুলো প্রোগ্রামে দেওয়া যুক্তির উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করে।

৭। অক্লান্ত কর্মক্ষমতা: মানুষের দিনে ৭ থেকে ৮ ঘন্টার মতো বিশ্রাম নেওয়ার প্রয়োজন থাকে। কিন্তু কম্পিউটারের মতো যন্ত্রনিরলসভাবে একটানা কাজ করে যেতে সক্ষম।

৮। সূক্ষ্ম প্রক্রিয়াকরণের ক্ষমতা। মানুষ যতোই জটিল গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হোক না কেন, সূক্ষ্ম গাণিতিক বিশ্লেষণে কম্পিউটারের মতো পাকা হিসেবি ও সঠিক উত্তর প্রদান মানুষের পক্ষে সবসময় দেওয়া অসম্ভব। তাই কম্পিউটার যে. কোনো গাণিতিক সমস্যার ফল যদি দশমিকের ঘর অতিক্রম করে, তবে সেই উত্তরও সে নির্ভুলভাবে প্রকাশ করতে পারে।

৯। বহুমুখিতা। একটি গণকযন্ত্র মাল্টিটাস্কিং বা একসাথে অনেকগুলো কাজ করতে সক্ষম। গাণিতিক সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি এই যন্ত্র বৈজ্ঞানিক গবেষণা, তথ্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, ইন্টারটেইনমেন্ট, শিক্ষা, টেলিকমিউনিকেশন ও অন্যান্য নানান ধরনের কাজ করতে পারে।

১০। স্বয়ংক্রিয়তা: কম্পিউটারকে তথ্য প্রদান বা ইনপুট দিলে বাকি সমস্ত কাজটা সে একাই করতে পারে। এই প্রসেসিং করারজন্য একটি গণকযন্ত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবেই কাজ করতে পারে।

কম্পিউটারের বিবর্তন

- কম্পিউটার উদ্ভাবন ও বিস্তারের পিছনে রয়েছে শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি ও গবেষণার ফলাফল। বলা যায়, গণনার প্রচেষ্টা কম্পিউটার উদ্ভাবনের প্রাচীনতম ঘটনা। প্রাচীনকালে মানুষ গণনার জন্য নুড়ি, ঝিনুক, দড়ির গিট ইত্যাদি ব্যবহার করতো। খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চদশ অব্দে প্রথম গণনাযন্ত্র অ্যাবাকাস প্রচলন হয়। এরপর সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে গণনাযন্ত্রেরও অনেক পরিবর্তন সাধিত হয় এবং ১৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে ব্লেইজ প্যাসকেল আবিষ্কৃত গিয়ারচালিত গণনাযন্ত্র এক নতুন যুগের সূচনা করে। পরবর্তীতে ১৬৭১ সালে জার্মান গণিতবিদ গটফ্রাইড উইলহেম লিবনিজ (Gottfried Wilhelm Leibnitz) চাকা ও দণ্ড ব্যবহার করে গুণ ও ভাগের ক্ষমতাসম্পন্ন যান্ত্রিক ক্যালকুলেটর তৈরি করেন। সেই সময় কৌশল ততো উন্নত ছিল না এবং ক্যালকুলেটরের উপযুক্ত বৃদ্ধ যন্ত্রাংশ তৈরি অসম্ভব ছিল বিধায় এই যন্ত্র নির্ভরযোগ্য মনে হতো না। পরবর্তীতে যান্ত্রিক কৌশলের উন্নতির ফলে ক্যালকুলেটরের গুণগত মান উন্নত হয় এবং এই যন্ত্র নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠে।

কম্পিউটার প্রজন্মের বৈশিষ্ট্য

- সময়ের সাথে সাথে কম্পিউটারের গতি, তথ্য ধারণক্ষমতা, হিসাব করার ক্ষমতা ইত্যাদির দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে এবংবৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে। এই পরিবর্তনের ধারা বর্তমানেও বিদ্যমান। পরিবর্তন ও বিকাশের এক একটি পর্যায় বা ধাপকে প্রজন্ম (Generation) হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। প্রতিটি প্রজন্মে কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার ও সফট্ওয়্যারে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে প্রজন্ম হিসাবে কম্পিউটারকে পাঁচটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়।

নিম্নে প্রজন্মের ভিত্তিতে কম্পিউটারের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনকরা হলো-

১। প্রথম প্রজন্ম

২। দ্বিতীয় প্রজন্ম

৩। তৃতীয় প্রজন্ম

৪। চতুর্থ প্রজন্ম

৫। পঞ্চম প্রজন্ম

প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্য:

১। প্রধান ইলেকট্রনিক উপাদান হিসেবে বালব বা ভ্যাকুয়াম টিউব ব্যবহার করত।
২। আকারে বড়, প্রক্রিয়াকরণে ধীর এবং কম মেমরি ক্ষমতা ছিল।
৩। প্রচুর বিদ্যুৎ খরচ এবং তাপ উৎপন্ন করত।
৪। কম্পিউটিং ক্ষমতা সীমিত ছিল।
৫। সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য ছিল না।
৬। প্রোগ্রামিং-এর জন্য মেশিন স্তরের ভাষা ব্যবহার করত।
৭। খুব ব্যয়বহুল ছিল।
৮। উদাহরণঃ ENIAC, EDVAC, UNIVAC, IBM 650, Mark 1 ইত্যাদি।

দ্বিতীয় প্রজন্মের কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্য:

১। ট্রানজিস্টরের ব্যবহার।
২। ম্যাগনেটিক কোর মেমরির ব্যবহার।
৩। ফোরট্রান/কোবল ইত্যাদি প্রোগ্রামিং ভাষার উদ্ভব, বিকাশ ও ব্যাপক ব্যবহার।
৪। যন্ত্রপাতি ছোট হয়ে আসা।
৫। কম উত্তপ্ত হওয়া।
৬। কাজের গতি বৃদ্ধি।
৭। আস্থা ও নির্ভরশীলতা অর্জন।

তৃতীয় প্রজন্মের কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্য

- ট্রানজিস্টরের জায়গায় ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (IC) চিপ-এর ব্যবহার।
- সেমিকন্ডাক্টর মেমরি ডিভাইসের ব্যবহার।
- আকারে ছোট, সস্তা, বড় মেমরি এবং দ্রুত প্রসেসিং ক্ষমতাসম্পন্ন।
- এই প্রজন্মে মিনি কম্পিউটার চালু হয়েছিল।
- প্রোগ্রামিংয়ের জন্য উচ্চ-স্তরের ভাষা ব্যবহার।
- উদাহরণঃ IBM 360, IBM 370 ইত্যাদি।

চতুর্থ প্রজন্মের কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্য

- প্রধান সুইচিং উপাদান হিসাবে মাইক্রোপ্রসেসর ব্যবহার।
- এগুলোকে মাইক্রোকম্পিউটার বা ব্যক্তিগত কম্পিউটারও বলা হয়।
- এর আকার ডেস্কটপ থেকে ল্যাপটপ বা পামটপে পরিবর্তিত হয়।
- উচ্চ গতির প্রক্রিয়াকরণ, নির্ভুলতা, নির্ভরযোগ্য এবং বহুমুখী ব্যবহার।
- খুব বড় স্টোরেজ ক্ষমতাসম্পন্ন।

উদাহরণঃ IBM PC, Apple-Macintosh ইত্যাদি।

পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্য:

- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার।
- একাধিক মাইক্রোপ্রসেসরবিশিষ্ট একীভূত বর্তনী।
- স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুবাদে সক্ষম।
- বিশাল মেমরি ও স্টোরেজ সুবিধা।
- কণ্ঠস্বরে নির্দেশনা পালন।

অধ্যায়-২

আধুনিক ডিজিটাল কম্পিউটারের প্রকারভেদ

ডিজিটাল কম্পিউটার হলো এমন কম্পিউটার সিস্টেম, যা বাইনারি নম্বর সিস্টেম ব্যবহার করে গণনামূলক কাজ সম্পাদন করে।ডিষ্টিটাল কম্পিউটারের তিনটি প্রধান উপাদান হলো- ইনপুট, প্রসেসিং এবং আউটপুট। ১৯৪০-এর দশকের শেষের দিকে সংখ্যাসূচক গণনার জন্য প্রথম ডিজিটাল কম্পিউটার ডিজাইন করা হয়েছিল। প্রথম ডিজিটাল কম্পিউটারটি ছিল "ইলেকট্রনিক নিউমেরিক্যাল ইন্টিগ্রেটর অ্যান্ড কম্পিউটার" বা (ENIAC)।

কাজ করার প্রক্রিয়া অনুযায়ী কম্পিউটারকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যায়; যথা-

১। অ্যানালগ কম্পিউটার (Analog computer)

২। ডিজিটাল কম্পিউটার (Digital computer)

৩। হাইব্রিড কম্পিউটার (Hybrid computer)।

অ্যানালগ কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্য:

- • এর পরিমাপের একক হলো ভৌত মান। যেমন-তাপমাত্রা এবং চাপ।
- • ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গ ব্যবহার করে সংকেত প্রদান করে।
- • এর মেমরি ইউনিট এবং কম্পিউটিং টার্মিনাল নেই।
- • ইনপুট/আউটপুট ডিভাইস নেই।
- • এটি ভৌত ডিভাইসগুলোর ক্রমাগত পরিবর্তনশীল ডাটা নির্ধারণ করতে সক্ষম করে। যেমন- থার্মোমিটার।
- • উদাহরণ হলো স্পিডোমিটার, টেলিফোন লাইন ইত্যাদি।
- • এর উপাদানগুলো হলো রেজিস্টার এবং ক্যাপাসিটর।
- • ধীর গতি।
- • এটি পরিচালনার জন্য প্রযুক্তিগত কর্মীদের প্রয়োজন।
- • এটি ক্রমাগত আকারে ডাটা প্রদর্শন করে।

ডিজিটাল কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্য

- এই কম্পিউটারের সাহায্যে Human interface ছাড়া মাল্টিটাস্কিং কাজ করা যায়, যেমন- কম্পিউটারে সংযুক্ত থাকা প্রিন্টার থেকে ৫০ টি প্রিন্ট করার অনুমোদন দেওয়া হলে কম্পিউটার ৫০ টি প্রিন্ট না হওয়া পর্যন্ত তার কাজ চালিয়ে যাবে। প্রিন্ট হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে না।
- ডিজিটাল কম্পিউটার বাইনারি সংখ্যা ০ এবং ১ সংখ্যার উপর ভিত্তি করে কাজ করে।
- নির্ভুলভাবে কাজ করা যায়।
- ডিজিটাল সিগন্যালডিজিটাল কম্পিউটারের স্টোরেজ ক্ষমতা অনেক বেশি এবং প্রচুর ডাটা স্টোর করে রাখা সম্ভব।
- এই কম্পিউটারের স্পিড অনেক বেশি। খুব দ্রুত ব্যবহারকারীকে আউটপুট প্রদান করতে পারে।
- ডিজিটাল কম্পিউটারে মাল্টিটাস্কিং কাজ করা সম্ভব।
- অর্থাৎ, দক্ষতার সাথে এক সাথে অনেক ধরনের কাজ করা যায়ডিজিটাল কম্পিউটার ব্যবহার করা বেশ সহজ।

হাইব্রিড কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্যঃ

- • অ্যানালগ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির সমন্বয়ে মিশ্র প্রযুক্তিতে তৈরি।
- • ইনপুট অ্যানালগ প্রকৃতির এবং আউটপুট ডিজিটাল পদ্ধতির।
- • বিশেষ বিশেষ কাজে ব্যবহার করা হয়।
- • গঠন জটিল প্রকৃতির।
- • তুলনামূলকভাবে দাম বেশি। বিষয়ের বিচ্ছিন জটিল

সুপার কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্যঃ

- আকৃতির দিক দিয়ে খুবই বড় এবং শক্তিশালী।
- সুপার কম্পিউটার এক সাথে একাধিক ব্যবহারকারী ব্যবহার করতে পারে।
- এ ধরনের কম্পিউটার অত্যন্ত শক্তিশালী এবং অত্যন্ত দ্রুতগতিতে কাজ করতে পারে।
- এ ধরনের কম্পিউটার পর পর ১০ লক্ষ লাইনে লেখা সুবিশাল কর্মসূচিকে নিজের অস্থায়ী স্মৃতিশক্তির মধ্যে সঞ্চয় করে রেখে সেই অনুযায়ী কাজ করে ফলাফল জানিয়ে দিতে পারে।
- অনেক শক্তিশালী মানের এ কম্পিউটারের অনেক বড় বড় এবং জটিল ও সূক্ষ্ম কাজ করার ক্ষমতা রয়েছে।
- একসাথে একাধিক প্রসেসর ব্যবহার করা হয়।
- ভেক্টর প্রসেসিং টেকনিক ব্যবহার করা হয়। আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন।

অধ্যায়- ৩

ডিজিটাল কম্পিউটারের মৌলিক অপারেশন

একটি কম্পিউটার মূলত ডাটা প্রক্রিয়াকরণের জন্য ব্যবহৃত একটি ডিভাইস। এটি নিম্নলিখিত তিনটি অপারেশন ক্রমানুসারে নির্দেশাবলি অনুযায়ী ডাটা প্রক্রিয়া। ফলাফল বা আউটপুট প্রদান অর্থাৎ তথ্য প্রদান। কম্পিউটার পরিচালনার এই চক্রটি ইনপুট প্রক্রিয়া, আউটপুট চক্র নামে পরিচিত। ইনপুট প্রক্রিয়া, আউটপুট চক্রইনপুট ডিভাইসের মাধ্যমে কম্পিউটারে ডাটা সরবরাহ করা হয়। তারা এনকোডিং হয় এমন একটি উপায়ে, যা কম্পিউটার বুঝতে পারে। তারপর এটিকে প্রদত্ত নির্দেশাবলির সাহায্যে ডাটা প্রসেস করে। এরপর এটি একটি অর্থপূর্ণ এবং পছন্দসই আউটপুট তৈরি করে, যাকে ইনফরমেশন বা তথ্য বলা হয়। উপরোক্ত ফাংশনগুলো সম্মিলিতভাবে ডিজিটাল কম্পিউটার পরিচালনার মৌলিরঅপারেশন বলা হয়। এগুলো নিম্নরূপ প্রসারিত করা যেতে পারে-

- ইনপুট গ্রহণ করা
- মেমরি ম্যানিপুলেশন
- অ্যারিথমেটিক অপারেশন
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং
- আউটপুট প্রদান করা।

একটি ডিজিটাল কম্পিউটারের ব্লক ডায়াগ্রাম

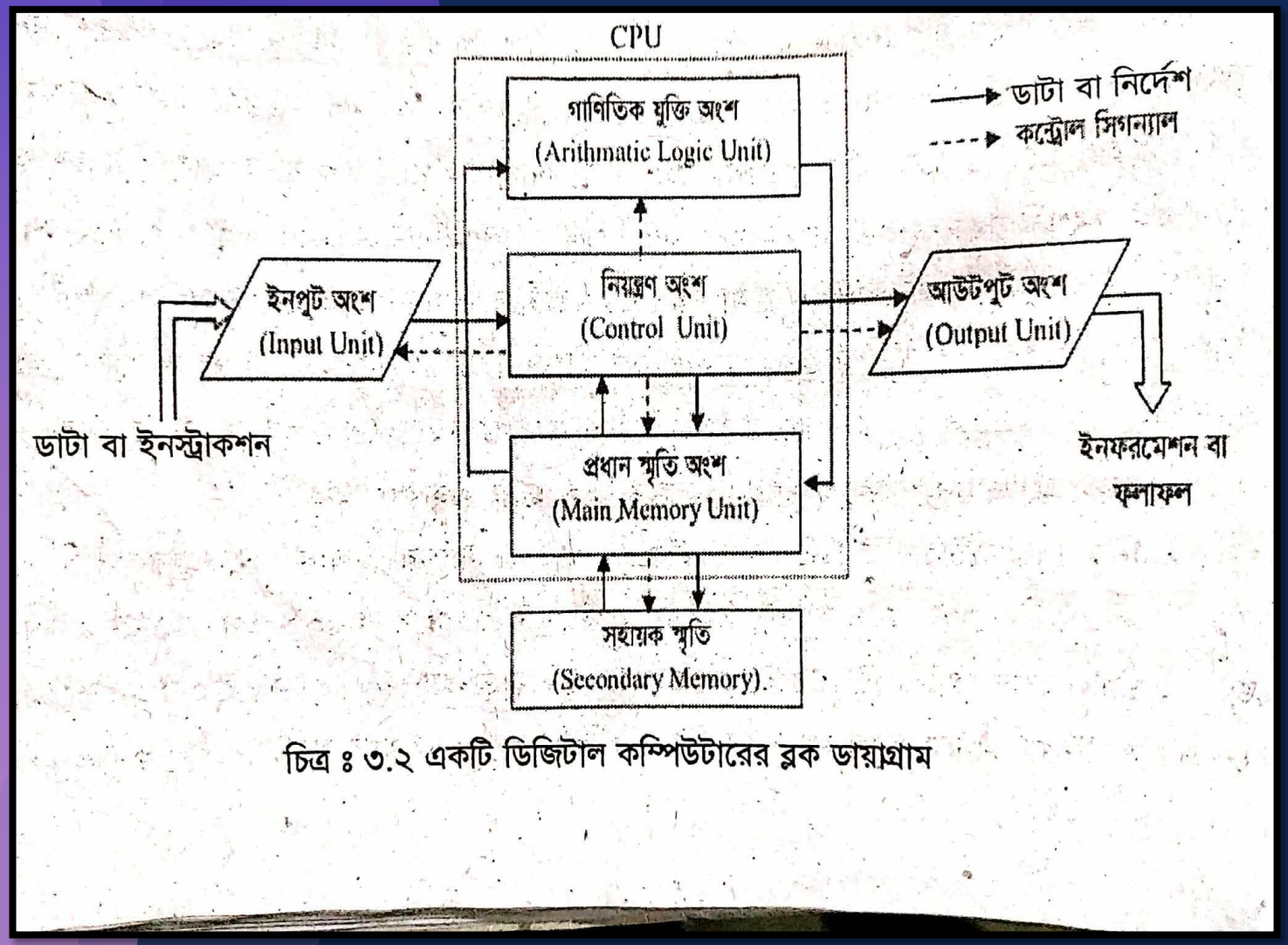

চিত্র ঃ ৩.২ একটি ডিজিটাল কম্পিউটারের ব্লক ডায়াগ্রাম

ভিজিটাল কম্পিউটার সিস্টেমের মৌলিক সংগঠন

কম্পিউটার বিভিন্ন প্রকার যন্ত্র বা যন্ত্রাংশের সমন্বয়ে গঠিত। বিভিন্ন ধরনের কাজের প্রয়োজনে কম্পিউটারের বিভিন্ন বস্ত্র যন্ত্রাংশ সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী পরস্পরের সাথে সংযুক্ত থাকে। কম্পিউটারের বিভিন্ন যন্ত্র ও যন্ত্রাংশকে পারস্পরিক সংযোগ হারা। সংযুক্ত করা অবস্থাকেই কম্পিউটার সংগঠন বলা হয়। কম্পিউটার সংগঠনের প্রধান পাঁচটি ইউনিট রেয়েছে। যথা-

- ইনপুট অংশ (Input Unit)
- নিয়ন্ত্রণ অংশ (Control Unit)
- গাণিতিক যুক্তি অংশ (Arithmetic Logic Unit)
- স্মৃতি অংশ (Memory Unit)
- আউটপুট অংশ (Output Unit)

অবশ্য স্মৃতি, গাণিতিক যুক্তি অংশ ও নিয়ন্ত্রণ অংশকে একত্রে কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশ বা সিপিইউ (CPL)) বলা হয়।

১। ইনপুট অংশঃ ইনপুট ইউনিট ব্যবহারকারী প্রদত্ত উপাত্ত বা বিভিন্ন উৎস থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করে সিপিইউ বা কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশের প্রধান স্মৃতিতে সংরক্ষণ করে। অর্থাৎ, ইনপুট অংশের কাজ হলো ব্যবহারকারী বা বিভিন্ন উৎস থেকে ডাটা বা নির্দেশ গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশে প্রেরণ করা। বিভিন্ন ধরনের ইনপুট ডিভাইসের মাধ্যমে ইনপুট ইউনিট কম্পিউটারকে। ডাটা বা নির্দেশ প্রদানের কাজটি সম্পাদন করে। এ ধরনের কিছু ইনপুট ডিভাইসের উদাহরণ হলো কী-বোর্ড, মাউস, স্ক্যানার, ওএমআর (OMR), ওসিআর (OCR), জয়স্টিক, পাঞ্চকার্ড, লাইটপেন ইত্যাদি।

২। নিয়ন্ত্রণ অংশঃ কন্ট্রোল বা নিয়ন্ত্রণ ইউনিট কম্পিউটারের সকল অংশকে নিয়ন্ত্রণের ও পরিচালনার কাজে নিয়োজিত থাকে। এটি কম্পিউটারের প্রতিটি নির্দেশ পরীক্ষা করে এবং কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় সংকেত তৈরি করে। মেমরিতে কখন তথ্যের প্রয়োজন হবে, সহায়ক মেমরি হতে কখন প্রধান মেমরিতে তথ্য নিতে হবে, কখন ইনপুট থেকে উপাত্ত নিতে হবে, কখন ফলাফল দিতে হবে- এ সব বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে। নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের প্রধান কাজই লোহ মেমরি হতে ইনস্ট্রাকশন কোড পড়া ও ডিকোড করা এবং মাইক্রোপ্রসেসরের অন্য অংশসমূহকে কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজনীয় কন্ট্রোল সিগন্যাল তৈরি করা। যেমন- গাণিতিক কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য মাইক্রোপ্রসেসরের গাণিতিক যুক্তি অংশকে কন্ট্রোল সিগন্যালের মাধ্যমে নির্দেশ প্রদান করা।

৩। গাণিতিক যুক্তি অংশ: নিয়ন্ত্রণ অংশের তত্ত্বাবধানে গাণিতিক যুক্তি অংশ বা ALU বিভিন্ন ধরনের গাণিতিক বা লজিক্যাল অপারেশনের কাজ সম্পাদন করে। বেশিরভাগ গাণিতিক অপারেশনগুলো হলো যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ এবং লজিক্যাল অপারেশনগুলো হলো তুলনা, সত্য-মিথ্যা যাচাই ইত্যাদি। আবার কোনো রেজিস্টার পরিষ্কারকরণ এবং রেজিস্টারে সংরক্ষিত তথ্য বা সংখ্যাকে ডানে-বামে সরানো ইত্যাদি কাজও এ অংশের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক বর্তনীর সহায়তায় গাণিতিক যুক্তি অংশই এ কার্যাবলি সম্পাদান করে থাকে এবং প্রয়োজনে ফলাফল অস্থায়ীভাবে রেজিস্টারে সংরক্ষিত রাখে। বর্তমানের মাইক্রোপ্রসেসরগুলোতে কাজের গতি বাড়ানোর প্রয়োজনে একাধিক গাণিতিক যুক্তি অংশ ব্যবহৃত হয়।

৪। মেমরি বা স্মৃতি অংশঃ কোনো সমস্যা সমাধান করার জন্য কম্পিউটারে যে-সব উপাত্ত বা নির্দেশাবলি ইনপুট ডিভাইসের সাহায্যে দেওয়া হয় তা কম্পিউটারের স্মৃতি অংশে জমা হয়। কম্পিউটারে সাধারণত প্রধান ও সহায়ক স্মৃতি অংশ বিদ্যমান। প্রধান স্মৃতি একটি পঠন/লিখন অর্ধপরিবাহী স্মৃতি। প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রোগ্রাম ও উপাত্তকে এ অংশে সংরক্ষণ করা হয়। এছাড়া প্রোগ্রাম নির্বাহের সময় অন্তবর্তীকালীন ফলাফলকে এ ধরনের স্মৃতি অংশে সংরক্ষণ করা হয়। তথ্যকে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের জন্য সহায়ক স্মৃতির প্রয়োজন হয়। র‍্যাম হচ্ছে প্রধান স্মৃতি, হার্ডডিস্ক ও ফ্লপি ডিস্ক হচ্ছে সহায়ক স্মৃতি।

৫। আউটপুট ইউনিট: আউটপুট ইউনিট কম্পিউটারের প্রক্রিয়াকরণের ফলাফল ব্যবহারকারীর কাছে উপস্থাপন করে। আউটপুট ইউনিটের এ ধরনের কাজের জন্য বিভিন্ন ধরনের আউটপুট ডিভাইস ব্যবহৃত হয়। মনিটর, প্রিন্টার, প্লটার, স্পিকার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ইত্যাদি হলো আউটপুট ডিভাইসের উদাহরণ। এছাড়া হার্ডডিস্ক, পেনড্রাইভ ইত্যাদিতেও ফলাফল রেকর্ড করে রাখা যায়। যখন কোনো আউটপুট কাগজে ছাপা হয় তখন তাকে হার্ডকপি বলে এবং যখন মনিটরে দেখা হয় তখন তাকে সফটকপি বলে।

অধ্যায়- ৪

কম্পিউটার মেমরি

মেমরি হচ্ছে কম্পিউটারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মেমরি লক্ষ লক্ষ স্মৃতি কোষ নিয়ে গঠিত, যেখানে একটি বিট ০ বা ১ সংরক্ষণ করা যায়। কম্পিউটারের অভ্যন্তরে যে অংশে তথ্যসমূহ স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে জমা থাকে, তাকে কম্পিউটারের মেমরি বা মোদি বলা হয়। প্রক্রিয়াকরণের সুবিধার জন্য মেমরিতে তথ্য জমা রাখা হয় এবং প্রয়োজনে কাজে লাগানো যায়।

- **ভোলাটাইল বা উদ্বায়ী মেমরি** (Volatile memory): বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে যে মেমরির তথ্য মুছে যায়, তাকে উদ্বায়ী স্মৃতি বা ভোলাটাইল মেমরি বলে। যেমন- RAM
- **নন-ভোলাটাইল মেমরি বা অনুবায়ী** (Non-volatile memory) : বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে যে মেমরির তথ্য মুছে যায় না, তাকে অনুদ্বায়ী স্মৃতি বা নন-ভোলাটাইল মেমরি বলে। যেমন- ROM.
- **ধ্বংসাত্মক** (Destructive) **মেমরি** :যদি কোনো মেমরি পঠনের পর সংরক্ষিত তথ্য মুছে যায়, তাহলে তাকে ধ্বংসাত্মক মেমরি বলা হয়। যেমন- চৌম্বক কোর মেমরি।
- **অধ্বংসাত্মক** (Non-destructive) **মেমরি:** যদি পঠনের পর সংরক্ষিত তথ্য মুছে না যায় তাহলে তাকে অধ্বংসাত্মক মেমরি বলে। যেমন- চৌম্বক টেপ।

PICTURE OF MEMORY

মেমরির শ্রেণিবিভাগ

কম্পিউটার সিস্টেমে ব্যবহৃত মেমরিকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়; যথা

১। প্রধান মেমরি বা মুখ্য মেমরি (Main memory or Primary memory)

২। সহায়ক মেমরি বা গৌণ মেমরি (Secondary memory or Mass memory) ও

৩। ইন্টারনাল মেমরি (Internal memory)।

র‍্যাম ও রমের বৈশিষ্ট্য

RAM-এর পুরো অর্থ হচ্ছে Random Access Memory, র‍্যামে অত্যন্ত সহজে তথ্য সংরক্ষণ করা যায় এবং প্রয়োজনে তথ্যমুছে ফেলা যায়। তথ্য পড়া ও লেখা উভয় প্রকার কাজই র‍্যামে সম্পাদন করা যায় বলে র‍্যামকে লিখন/পঠন (Read/Write Memory) স্মৃতিও বলা হয়। কম্পিউটার চালু করার সাথে সাথেই কম্পিউটার পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম ও ডাটা র‍্যামের স্মৃতিতে চলে আসে। কিন্তু বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করলে র‍্যামে সংরক্ষিত সকল তথ্য মুছে যায়। তাই একে ভোলাটাইল স্মৃতি বাঅস্থায়ী স্মৃতিও বলা হয়।

এ ধরনের মেমরির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো-

১। র‍্যাম এক ধরনের ভোলাটাইল মেমরি (Volatile memory) |

২। তথ্য পড়া ও লেখা উভয় প্রকার কাজই র‍্যামে সম্পাদন করা যায়।

৩। র‍্যামের তথ্য বা প্রোগ্রামকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করে পুনরায় সংরক্ষণ করা যায়।

৪। কম্পিউটার চালু করার সাথে সাথেই কম্পিউটার পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম ও ডাটা র‍্যামের স্মৃতিতে চলে আসে।

৫। বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করলে র‍্যামে সংরক্ষিত সকল তথ্য মুছে যায়।

৬। র‍্যামের প্রতিটি মেমরি সেলের জন্য অ্যাকসেস সময় সমান।

এসএসডি (SSD)-এর বৈশিষ্ট্য

SSD-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে সলিড স্টেট ড্রাইভ। এটি ডেস্কটপ, ল্যাপটপ, সার্ভার, পিসি ইত্যাদির মতো ডাটা স্টোরেজ ডিভাইসের জন্য একটি এন্টারপ্রাইজ হিসাবে আরো আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এসএসডির বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা নিম্নরূপ-

১। ডাটা স্থানান্তর হার: SSD-এর জন্য ডাটা স্থানান্তর হার 100-500 Mb/s/সেকেন্ডের মধ্যে হয়ে থাকে।

২। র‍্যান্ডম অ্যাক্সেস টাইম: যেহেতু ডাটা সরাসরি ফ্ল্যাশ মেমরি থেকে অ্যাক্সেস করা হয়, তা প্রায় ল্যাগ-ফ্রি এর মতো কাজ করে। এর বুট টাইম খুবই কম অর্থাৎ খুব কম সময়ের মধ্যেই কম্পিউটার সিস্টেম চালু যায়।

৩। Noise : SSD ড্রাইভে কোনো গতিশীল অংশ নেই তাই এতে কোনো নয়েজ তৈরি হয় না।

৪। ফ্র্যাগমেন্টেশন: SSD-এর জন্য ফ্র্যাগমেন্টেশন দরকার হয়না।

৫। শক্তি খরচ: SSD ড্রাইভ ৩০% থেকে ৬০% শক্তি খরচ হয়। এটি HDD ড্রাইভের তুলনায় কম শক্তি খরচ হয়।

৬। পাওয়ার ইফিসিয়েন্সি: SSD কাজ করার সময় এবং নিষ্ক্রিয় অবস্থায় উভয়ই কম পাওয়ারের প্রয়োজন হয়।

৭ । ডাটা অ্যাক্সেসের সময়: SSD দ্রুতগতিসম্পন্ন এবং সাধারণত SSD HDD ড্রাইভের চেয়ে ৮০-১০০ গুণ দ্রুতগতিসম্পন্ন হয়ে থাকে।

৮। বহন করা সহজ: SSD-এর উপাদানগুলো সাধারণত হালকা ওজনের হয়ে থাকে।

৯ ।বিভিন্ন আকৃতিসম্পন্ন: সলিড-স্টেট ড্রাইভ বিভিন্ন সাইজের হয়ে থাকে; যেমন- ২.৫", ১.৮" এবং ১.০" ইত্যাদি।

১০। স্থায়িত্ব : হার্ড ডিস্কের তুলনায় এসএসডি বেশিদিন দীর্ঘস্থায়ী হয়। হার্ড ডিস্ক যেখানে গড়ে টেকে পনেরো লক্ষ ঘন্টা, এসএসডি যায় তার থেকেও বেশি, প্রায় বিশ লক্ষ ঘন্টা হয়ে থাকে।

১১। ধারণক্ষমতা: এসএসডি (SSD) এর ধারণক্ষমতা সাধারণত সর্বোচ্চ ৪ টেরাবাইট পর্যন্ত হয়ে থাকে।

অধ্যায় – ৫

ইনপুট ডিভাইসের কার্যাবলি

কম্পিউটার বিভিন্ন ধরনের হার্ডওয়্যারের বা ডিভাইসের মাধ্যমে ব্যবহারকারীর কাছ থেকে কিংবা বিভিন্ন পরিবেশ থেকে প্রক্রিয়াকরণের জন্য বিভিন্ন ধরনের ডাটা গ্রহণ করে। কম্পিউটারের প্রতিব্যাকরণের কাজে ডাটা প্রদানে নিয়োজিত হার্ডওয়্যারসমূহই হলো ইনপুট ডিভাইস। কম্পিউটার সিস্টেমে বিভিন্ন ধরনের ইনপুট ডিভাইস ব্যবহৃত হয়। কম্পিউটারকে হার্ডওয়্যার ডিভাইসের এর মাধ্যমে instruction বা আদেশ দেওয়া হয়। এই Instruction বা commandগুলো cpu-তে পৌঁছায়, Cpu সেটি প্রসেসিং করে আউটপুট ডিভাইস-এ পাঠায়।

এই ডিভাইসগুলো দিয়ে আমরা কম্পিউটারকে বিভিন্ন তথ্য প্রদান করি। যেহেতু এগুলো দিয়ে আমরা কম্পিউটারকে ইনপুটপ্রদান করি, সেজন্যে এগুলোকে ইনপুট ডিভাইস বলা হয়। একেকটি ইনপুট ডিভাইসের কাজ একেক রকম। নিচে বিভিন্ন ইনপুট ডিভাইসসমূহ নাম দেওয়া হলো-

১। কী-বোর্ড (Keyboard)

২। মাউস (Mouse)

৩। ট্র্যাকবল (Trackball)

৪। জয়স্টিক (Joystick)

৫ । টাচ স্ক্রিন (Touch Screen)

৬। বার কোড রিডার (Bar Code Reader)

৭। পয়েন্ট অফ সেল (Point of Sale)

৮। ওএমআর (OMR)

৯। ওসিআর (OCR)
১০। স্ক্যানার (Scanner)
১১। ডিজিটাইজার (Digitizer)
১২। লাইটপেন (Lightpen) (Digital Camera)
১৩। গ্রাফিক্স প্যাড (Graphics Pad)
১৪। ডিজিটাল ক্যামেরা

কী-বোর্ড এর বাটনগুলোর কাজঃ

- Alt- বিভিন্ন Program-এ বিভিন্ন নির্দেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে পৃথক পৃথকভাবে ব্যবহার হয় এবং বিভিন্ন Command বানানো যায়।
- Shift key- লেখার সময় বড় ও ছোট হাতের অক্ষর করার প্রয়োজন হলে নির্দিষ্ট কোনো Word এই Key-এর সাথে একসঙ্গে চেপে ধরলে অক্ষরটি সাথে সাথে বড় ও ছোট হাতের অক্ষর হয়ে যায়।

- Print screen-Computer-এর পর্দার দৃশ্যত যা কিছু থাকে তা সবগুলা প্রিন্ট করতে চাইলে এই কী-এর প্রয়োজন হয়।
- Insert key- কোনো লেখার মধ্যে কোনো কিছু লেখার দরকার হলে তা সাধরাণত ডানপাশ থেকে লেখা হয়, তবে এই কী চেপে লিখলে তা আগের অক্ষরের উপর Over writing হয়।
- Enter key- কম্পিউটারকে কোনো নির্দেশ দিয়ে সেটি কার্যকর করতে এই কী ব্যবহার করা হয় ও এক লাইনের লেখা শেষ করে পরের লাইনে বা অন্য লাইনে যাওয়ার জন্য
- Enter key ব্যবহৃত হয় এবং Enter key-এর সাহায্যে Ok button-এর কাজও হয়ে থাকে।
- Pause Break- যদি Computer কোনো লেখা দ্রুত গতির জন্য পড়তে সমস্যা হয়, তবে এই কী চেপে তা ভালোভাবে পড়া যায়।
- Tab key- পর্দায় অনুচ্ছেদ শুরুর স্থান, প্যারাগ্রাফ, কলাম, নম্বর ইত্যাদি প্রয়োজন অনুযায়ী প্রস্তুতের জন্য এই কী ব্যবহৃতহয় এবং কী-বোর্ড শর্টকাট-এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।•
- Ctrl key- কী-বোর্ড শর্টকাট-এর জন্য কাজে লাগে। এই কী কী-বোর্ডের Right ও Left-এ থাকে। এই কী-এর সঙ্গেবিশেষ কী একসঙ্গে চেপে Command দেয়া হয়।
- Spacebar- দুটি ওয়ার্ড-এর মাঝে gap দেয়ার জন্য প্রয়োজন হয়।
- Arrow key- কোনো Page-এর Right-Left ও Up-Down-এ যাওয়ার জন্য Arrow key ব্যবহৃত হয়।
- Caps lock key- অক্ষর ছোট-বড় করার জন্য Caps lock key প্রয়োজন। লেখা বড় হাতের অক্ষর করার জন্য Caps lockkey চালু করা হয়ে থাকে, আর Off করে দিলে লেখা পুনরায় ছোট হাতের অক্ষর হয়।
- Backspace- কোনো লেখার পিছনের অংশ Delete করতে Backspace ব্যবহৃত হয়।
- Number key- ০ থেকে শুরু করে ৯ পর্যন্ত যে Number-গুলে দেওয়া রয়েছে, সেগুলো Numeric লিখতে প্রয়োজন হয়।
- Windows logo key- Start মেনু Open করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।
- Esc key- এটি বর্তমানে চালু হওয়া কোনো কিছু Off করতে এই কী প্রেস প্রয়োজন হয় ও কোনো নির্দেশ বাতিল করা হয়ে থাকে।•
- Delete Key-Select করা কোনো File এবং Text Delete করার জন্য কাজে লাগে